বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের মোকাবিলায়

নাগরিক মঞ্চ

কলকারখানা সংক্রান্ত একমাত্র অনুসন্ধানমূলক পত্রিকা

চতুর্দশ সংখ্যা : সেপ্টেম্বর '৯১ : বিনিময়—দেড় টাকা

এ সংখ্যায় যা আছে

* জিনিষের দাম কেন বাড়ে।
* ন্যাশনাল ট্যানারীতে কাজ চালু করতে হবে।
* একটি চিঠি পাঠান
* বি আই এফ আর এ নাগরিক মঞ্চ।
* পথে বসেছেন আজ শ্রীদুর্গার শ্রমিকরা।
* দালায় শ্রমিক হত্যা।
* প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বকেয়ায় সরকারী সংস্থা

২১শে সেপ্টেম্বর রাজেশ্বর রাই দিবস

২১শে সেপ্টেম্বর '৯০। বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের শ্রমিকদের ভাতার দাবিতে চলছিল সারাদিন ব্যাপী প্রচারাভিযান। সেদিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে নাগরিক মঞ্চের আহ্বানে শ্রমিকদের সাথে সাধারণ নাগরিকরা একত্রিত ভাবে আওয়াজ তুলেছিলেন—বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা দিতে হবে। মেটাল বক্স, কোলেবিস্কুট, ওরিয়েন্টাল মেটাল, ইণ্ডিয়া মেসিনারি সহ বন্ধ কারখানাগুলি চালু করতে হবে। সারাদিন ব্যাপী প্রচার যখন এসপ্ল্যানেডে বিশাল শ্রমিক, সাধারণ নাগরিক সমাবেশে পরিণত ঠিক তখনই খবর এল, অনাহারে নয়, এবার পুলিশের গুলিতে খুন হয়েছে গৌরীশঙ্কর জুটমিলের শ্রমিক **'রাজেশ্বর রাই'**। রাজেশ্বরের অপরাধ, যে টাকা গৌরীশঙ্করের মালিক তার থেকে কেটে নিয়েছে সেই 'কাটাওঁতর' টাকা সে চেয়েছিল। মালিক যখন শ্রমিকদের পাওনা দিতে অন্যায়ভাবে অস্বীকার করল তখন সরকারের রক্ষীরা ছিল নীরব। অপরাধীর অপরাধ তাদের কাছে কোন নিয়ম লঙ্ঘন নয়। যখন শ্রমিকরা চাইল তার নিজের টাকা, ন্যায্য দাবিদার শ্রমিকদের উপর চলল গুলি। এ সরকার, এ পুলিশ কার? দেখল গৌরীশঙ্করের শ্রমিক জানল পশ্চিমবাঙলার মানুষ। যে দাবি-র জন্য শহীদ হল রাজেশ্বর—আজ কম বেশী সমস্ত চটকলের শ্রমিকদের সেই একই দাবি। নাগরিক মঞ্চ এ বছর ২১শে সেপ্টেম্বর "শহীদ রাজেশ্বর রাই-দিবস হিসেবে" পালন করার আহ্বান জানাচ্ছে। সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী সাধারণ নাগরিকদের কাছে নাগরিক মঞ্চের আবেদন ২১শে সেপ্টেম্বর ফুল, চন্দন, মালায় নয়, আসুন রাজেশ্বর রাই দিবস পালন করি এই আওয়াজ তুলে—সমস্ত বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের অবিলম্বে ভাতা দিতে হবে। চটকলে 'কাটাওঁত' বেআইনী ঘোষণা করতে হবে। বি আই এফ আর এর কারখানা তুলে দেওয়ার চক্রান্ত বন্ধ কর।

সরকার নিচ্ছে, হাইকোর্টের আদেশ

অবিলম্বে ন্যাশনাল ট্যানারীতে কাজ চালু করতে হবে

"ক্যান্টিন বন্ধ করে দিয়েছে! এটা একটা ফৌজদারি অপরাধ"—ন্যাশনাল ট্যানারীর বর্তমান পরিচালক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে সংখ্যাধিক্য শ্রমিকদের আনা অভিযোগের শুনানী চলাকালীন মন্তব্য করলেন মাননীয়া বিচারপতি। ন্যাশনাল ট্যানারীর শুধু ক্যান্টিনই বন্ধ নয়, গেট খোলা থাকলেও কাজ বন্ধ।

'৯১র মার্চ মাসে ন্যাশনাল ট্যানারীর প্রায় তিনশ শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে বর্তমান ম্যানেজমেন্ট কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। হাইকোর্ট এই পিটিশন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কারখানার অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে আছে সিটু, আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২ জন করে ও অফিসার্স ইউনিয়নের থেকে ১ জন। মোট ৫ জনের ম্যানেজমেন্ট কমিটি। অথচ এরা কেউই স্ব স্ব ইউনিয়নের নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। অন্য বিষয়ে করা শ্রমিকদের সই জাল করে-কোর্টের কাছে পেশ করেছে। স্ব-ঘোষিত ৫ জন শ্রমিক-কর্মচারীনেতা যারা বর্তমান ম্যানেজমেন্ট কমিটি তারা কাজ বন্ধ করে দেয়। বাটা কোম্পানীসহ অন্যান্য কোম্পানীকে তাদের কাজ তুলে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। ক্যান্টিন বন্ধ করে দেয়। আর বেতন বন্ধ; ন্যাশনাল ট্যানারীর শ্রমিকদের কাছে কোন নতুন দুঃসংবাদ নয়।

কাজ, ক্যান্টিন, বেতন বন্ধ করে শ্রমিকদের মধ্যে তৈরী করা হয়েছে চরম সন্ত্রাস ও অনিশ্চয়তা। শ্রমিকদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে ম্যানেজমেন্ট কমিটির পক্ষে স্বাক্ষর করার জন্য। দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেও নামমাত্র মাইনে পাওয়া শ্রমিকরা তবু পিছিয়ে যায়নি। একদিকে তারা কাজ চালু করার জন্য আবেদন জানিয়েছে অন্যদিকে বর্তমান ম্যানেজমেন্ট কমিটির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ফিরিয়ে নেয়নি। চরম সন্ত্রাস তৈরী করেও শ্রমিকদের মনোবল ভাঙতে পারেনি সিটু, আই এন টি ইউ সি নেতৃত্বের একাংশ। শ্রমিকরা দলমত নির্বিশেষে প্রায় সবাই এককাট্টা বর্তমান স্বঘোষিত শ্রমিক-নেতাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

আজ ন্যাশনাল ট্যানারীতে কোন মালিক নেই। হাইকোর্টের আদেশেই স্বঘোষিত শ্রমিকনেতারা এসেছিল ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে। তারা কমিটিতে আসার পর কোম্পানীতে কাজ করেও শ্রমিকরা মাসে তিন-চারশ টাকার বেশী পায়নি। শ্রমিকদের ধারণা তারা সারাদিন ধরে যা কাজ করে তাতে তাদের পুরো বেতন দিয়েও লাভ হয়। অথচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি তা দেয় না। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজমেন্ট কমিটি কাজ বন্ধ করল। অথচ বিচারপতি উমেশ ব্যানার্জীর আদেশে ছিল 'কারখানা সচল রাখতে হবে।' সেই আদেশও তারা লঙ্ঘন করল কাজ, ক্যান্টিন বন্ধ করে। কোর্টের নির্দেশ ছাড়াই কোম্পানী থেকে মেসিন সরিয়ে। এই সন্ত্রাসের অবস্থা চলাকালীন কয়েকদিন শুনানীর পর ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয়া বিচারপতি ১২ই সেপ্টেম্বর '৯১ একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেন। মাননীয়া বিচারপতি বলেন, অবিলম্বে কাজ চালু করতে হবে, ক্যান্টিন খুলতে হবে ও শ্রমিকদের পাওনা বেতন ফেব্রুয়ারী মাস থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মিটিয়ে দিতে হবে। হিসেবে গরমিলের যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা নিয়ে ২১ দিন বাদে আবার শুনানী হবে।

একদিকে যখন এই মামলা চলছে অন্যদিকে তখন হাইকোর্টের আর এক ঘরে চলছে ন্যাশনাল টানারীর নিলাম। রাজ্য সরকার সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়ে কারখানা চালু করার প্রতিশ্রুতিসহ ৫০ লক্ষ টাকা দর দেয়। অন্য কোন পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য কোন প্রস্তাব না আসার কারণে একের পর এক দিন পড়তে থাকে। কোন সুরাহা না হওয়ায় ২৩ আগষ্টও যখন আবার পরবর্তী দিন ঠিক হতে চলেছে তখন ট্যানারীর সংখ্যাধিক্য সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারীরা সমবেতভাবে বিচারপতির কাছে আবেদন জানায়—"আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন দীর্ঘদিন ধরে অর্ধাহারে অনাহারে রয়েছি। অথচ একের পর এক দিন পড়ছে। কোনও সুরাহা হচ্ছে না। পঃ বঃ সরকার কিনতে চায়, আপনি সরকারকে দিয়ে দিন। আমরা কাজ চাই। বেতন চাই। যা বর্তমানে বন্ধ। আমরা আর কতদিন এভাবে থাকব।"

(এরপর ১২ পাতায়)

জিনিসের দাম কেন বাড়ে

দেবদাস ব্যানার্জী

কোন এক বাজারে হঠাৎ একদিন দেখা গেলো প্রতিদিনের তুলনায় মাছের যোগান প্রায় অর্ধেক। ওদিকে প্রায় সব ক্রেতাই হাজির। ফলে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে বচসা শুরু হলো। ক্রেতাদের মধ্যে যাদের বেশি দাম দেওয়ার সামর্থ আছে তারা মাছ কিনে নিল। অর্থাৎ, চাহিদা-যোগানের পরিমাণগত ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে মাছের দাম আগের দিনের তুলনায় বৃদ্ধি পেলো।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সহজতম বোধগম্য কারণ অবশ্যই চাহিদা-যোগানের পরিমাণগত ভারসাম্য হারানো। এছাড়া আরও নানা কারণে মূল্য বৃদ্ধি পায়। কখনও একটা বা কয়েকটা বা বেশ কয়েকটা জিনিসের দাম দেখতে পাওয়া গেল বেড়ে গেছে। আবার কখনও দেখা যায় গোটা অর্থনীতি জুড়ে সমস্ত জিনিসেরই দাম বেড়েছে বা বাড়ছে। এই শেষোক্ত ঘটনাকে মুদ্রাস্ফীতি আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও চাহিদার কারণে, না যোগানের কারণে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলো তা বহুক্ষেত্রেই আলাদা করা কঠিন তবুও বর্তমান আলোচনার সীমিত পরিসরে বিষয়টাকে সহজভাবে উপস্থাপন করার জন্য আমাদের তা করতে হবে।

উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলে স্বভাবতই চাহিদা নিরপেক্ষভাবে যোগান-মূল্য বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে, ক্রেতাদের আয় একই থাকলে যোগান-মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ঐ জিনিসের চাহিদা কমবে কি না তা নির্ভর করে জিনিসটা কতটা নিত্য প্রয়োজনীয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক্ঃ একটা পরিবার তার বর্তমান আয় থেকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম পরিমাণেই খাদ্যশস্য কিনতে পারে। এখন যদি খাদ্যশস্যের দাম সামান্য বাড়ে ঐ পরিবার সংসারের অন্যখাতে বরাদ্দ কমিয়ে অন্ততপক্ষে আগের পরিমাণ খাদ্যশস্য কিনতে চেষ্টা করবে। কারণ ওর কমে শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন সম্ভব নয়। কিন্তু যদি টেলিভিশনের দাম বাড়ে তাহলে অবশ্যই চাহিদা কমবে। তাই সাধারণভাবে উৎপাদক চাইবে যাতে জিনিসের দাম না বাড়ে। পরে দেখবো যে, উৎপাদকদের এই ইচ্ছা ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ উৎপাদকের সংখ্যা অনেক।

উৎপাদন খরচ মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, বিজ্ঞাপনবাবদ ব্যয়, ঋণের সুদ, ইত্যাদি এবং (খ) মজুরি। যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল যদি আমদানি করা হয় তাহলে সেগুলির মূল্যবৃদ্ধির কারণ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু ঐ মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশের অর্থনীতির উপর যে প্রভাব বিস্তার হয় তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

যদি ইস্পাত বা কয়লা বা বিদ্যুৎ ইত্যাদির দাম বাড়ে এবং মজুরি একই থাকে তা'হলেও যন্ত্রপাতির উৎপাদন-খরচ বৃদ্ধি পায় এবং যদি ধরে নিই উৎপাদকের লভ্যাংশের পরিমাণ একই আছে, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র উপরিউক্ত কারণেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে, যদিও বাজারে চাহিদা একই রয়েছে। এখন যদি এই জিনিসগুলি শ্রমিকের কেনা জিনিসগুলোর অন্যতম হয় তা'হলে সে দেখতে পাবে যে, তার আয় যেহেতু স্থির রয়েছে, আগের তুলনায় সে অনেক কম জিনিস কিনতে পারছে। অথচ তার শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদনের জন্য ঐ জিনিসগুলি আগের পরিমাণেই প্রয়োজন। ধরা যাক্, তার এবং তার পরিবারের জন্য বছরে ন্যূনতম ৩০ গজ কাপড়ের প্রয়োজন। কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধি হলো। তার মজুরির যে পরিমাণ সে আগে কাপড়ের জন্য ব্যয় করতো তা দিয়ে সে ২০ গজ কাপড় কিনতে পারছে। তার মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তার অবস্থার অবনতি ঘটেছে। মজুরি বৃদ্ধি হওয়ার দরকার। এবার মজুরি বৃদ্ধি পেলো, বিনিয়োগকারীর লভ্যাংশের পরিমাণ না বাড়লেও কমলো না, জিনিসের দাম দ্বিতীয় দফা বৃদ্ধি পেলো। এভাবেই চক্রাকারে জিনিসের দাম বেড়ে যেতে থাকে। একে আমরা খরচবৃদ্ধিজনিত মূল্যবৃদ্ধি হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

খরচবৃদ্ধিজনিত মূল্যবৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি আরও একভাবে দেখা দেয়। ধরা যাক্ গোটা অর্থনীতির দুটো ভাগঃ শিল্পক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র। শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত জনসাধারণ দিনে দিনে দেখছে যে আগে যে পরিমাণ কৃষিজাত পণ্যের বিনিময়ে শিল্পজাত পণ্য পাওয়া যেত এখন সেই পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক্ আগে ১০ কিলো চাল বিক্রি করলে ১০টা সাবান কেনা যেতো কিন্তু বর্তমানে ঐ পরিমাণ চালের বিনিময়ে ৫টা সাবান কেনা যাচ্ছে। স্বভাবতই কৃষকরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর

বিনিময়ের মূল্য বৃদ্ধি করতে চাইবে।

শ্রমিকদের মজুরির বেশীরভাগ অংশই ব্যয় হয় কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যের জন্য। সুতরাং কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে তার একই মজুরিতে খাদ্যদ্রব্য কেনার পরিমাণ কমবে। শুধুমাত্র শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদনের প্রয়োজনেই শ্রমিককে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন করতে হবে। মজুরি বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাবে। ফলে তৃতীয় দফায় মূল্যস্ফীতি ঘটবে।

অন্যদিকে, ধরা যাক্ কোন কারণে যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না, অথচ চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় উৎপাদন খরচ এক থাকলেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। লাভ বাড়বে উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীদের। মার খাবে ক্রেতারা। একে সাধারণভাবে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মূল্যবৃদ্ধি বা মূল্যস্ফীতি বলা যায়। এই ধরনের মূল্যবৃদ্ধি বিশেষ কিছু জিনিসের জন্য হতে পারে বা সাধারণ-ভাবে সমস্ত জিনিসের জন্যও হতে পারে।

ধরা যাক্ যে হারে শিল্পায়ণ বাড়ছে কৃষিপণ্যের উৎপাদন তার থেকে কম হারে বাড়ছে। ফলে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত জনসাধারণের বাড়তি চাহিদার ফলে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। আবার ধরা যাক্ কৃষিপণ্যের উৎপাদনের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকে কম। এক্ষেত্রেও বাড়তি চাহিদা কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে। কিন্তু কৃষিপণ্যের উৎপাদনের হার জন-সংখ্যাবৃদ্ধির হারের বা শিল্পায়ণের হারের সমান বা বেশি; সেক্ষেত্রেও কেন আমরা কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি দেখতে পাই?

প্রথমেই জানা দরকার যে, বাজারজাত কৃষিপণ্যের একটা বড় অংশ distress sale বা দারিদ্র্যের কারণে বিক্রি করা ও পুরোপুরি marketable surplus বা নিজস্ব প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিক্রয় নয়। যখনই শস্য উৎপন্ন হচ্ছে ঋণের কারণে বা অন্য কোন দায়গ্রস্ততার জন্য কৃষক ঐ উৎপাদনের একটা বড় অংশ বিক্রি করে দিচ্ছে। আর বৎসরের বাকী সময় ঐ কৃষকই বাড়তি দামে বাজার থেকে কৃষিপণ্য কিনে খাচ্ছে। এছাড়াও ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেরও বেশি দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে বাস করে, সারা বছর রোজ যারা আহার পর্যন্ত যোগাড় করতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রায় ২২ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার সরকারের হাতে রয়েছে তার একটা বড় অংশই এই দারিদ্রতার কারণে সঞ্চিত। এমতাবস্থায় জনসাধারণের সেই অংশের, যারা দুবেলা পেটপুরে খেতে পারে না, তাদের যদি ক্রয়-ক্ষমতা হঠাৎ বৃদ্ধি পায় তা'হলে খাদ্যশস্যের বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি হবে। মজুত ভাণ্ডার থেকে খাদ্যশস্য ছাড়া না হলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে সমাজের ক্রয়ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ক্রয়ক্ষমতার সাথে সাথে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কোন বিশেষ বিশেষ জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে না। অথবা ধরা যাক্, পাতাল রেল বা দ্বিতীয় হুগলী সেতু নির্মাণে অর্থ বিনিয়োগ করার কারণে বাড়তি শ্রম সংস্থান হয়েছে। অথচ প্রত্যক্ষ কোনও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের চাহিদা অনুযায়ী যদি খাদ্যশস্যের যোগান না বাড়ে তবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। অন্যদিকে পরোক্ষভাবে এই ধরনের বিনিয়োগ উৎপাদনের পরিকাঠামো ভবিষ্যতে উন্নত করবে এবং উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে। তাছাড়াও এই ধরনের বিনিয়োগ ইস্পাত, সিমেন্ট ইত্যাদির চাহিদা বাড়াবে: ফলে এই সমস্ত শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ লাভবান হবে। ফলে শিল্পের বিস্তার ঘটবে, বাড়তি কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু অহেতুক যদি এই ধরনের প্রকল্প বিলম্বিত হয় তা'হলে তার কুফল সুফলের থেকে অনেক বেশি হবে। এগুলো যেহেতু সরকারী প্রকল্প সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটবে অথচ আয় বাড়বে না। ক্রমশ এই ধরনের অসম্পূর্ণ প্রকল্পে টাকা ঢালার প্রয়োজনে হয় সরকারকে করের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে অথবা বাড়তি ঋণ করতে হবে, অথবা টাকা ছাপিয়ে যোগান বাড়াতে হবে। শেষোক্ত দু'টো পদ্ধতি ঘাটতি বাজেট হিসাবে পরিচিত।

এক ধরনের অর্থনীতিবিদদের চিন্তায় ঘাটতি বাজেট অর্থ-নীতিতে গতির সঞ্চার করে। ঘাটতি বাজেটের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, বিনিয়োগ লাভজনক হয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। ঘাটতি বাজেট কি ধরণের বা কতটা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবে তা নির্ভর করে বাড়তি ব্যয় কিসের ওপর করা হবে। অর্থাৎ উৎপাদনে বিনিয়োগের জন্য না কি consumption expenditure যেমন কর্মচারীদের মাইনে বৃদ্ধি, সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে। এমনকি যে ধরনের উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হবে তা কতদিনে উৎপাদন বৃদ্ধি করবে? এসব দিয়েই ঠিক হয় মুদ্রাস্ফীতির হার কি হবে।

টাকার যোগান যদি তুলনামূলকভাবে মোট উৎপাদনের অতিরিক্ত হয় সেই টাকা যাদের হাতে যাবে তারা জিনিসের বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি করবে। ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। আবার যদি বাড়তি ঋণ সরকার বাজার থেকে সংগ্রহ করে তবে প্রাইভেট সেকটরের ঋণ পাওয়ার সুযোগ কমবে। ফলে সুদের হার বেড়ে

যাবে। উৎপাদন মূল্যও বেড়ে যাবে।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে যারা তাদের প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্য বর্তমান আয় থেকেই কিনে নিতে পারছে তাদের বাড়তি আয় খাদ্যদ্রব্যর জন্য বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি করবে না। বাড়তি আয় বস্ত্র, জুতো, বাসস্থান, শিক্ষা, সামাজিক বিনোদন ইত্যাদির উপর ক্রমানুসারে ব্যয়িত হবে। এমন যদি দেখা যায় যে সরকারের ঘাটতি বাজেট-এর একটা বড় অংশ সমাজ উন্নয়নমূলক প্রকল্প যথা, IRDP, NRLEP ইত্যাদি খাতে ব্যয় হবে তা' হলে ধরেই নিতে হবে যে দুঃস্থ মানুষের হাতে টাকা যাবে। ফলে খাদ্য শস্যের যোগান ঠিক না রাখতে পারলে দাম বাড়বে। কারণ তারা পেটপুরে খেতে পেতো না। এখন বাড়তি আয় তাদের সেই সুযোগ কিছুটা এনে দিচ্ছে। অন্যথায় যদি দেখা যায় বাড়তি অর্থের যোগান এমন জনসংখ্যার হাতে পড়বে যাদের হয়তো প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্যর ক্রয়ক্ষমতা আছে; কিন্তু বাড়তি আয় তারা বস্ত্রের উপর ব্যয় করবে। এক্ষেত্রে বস্ত্রের যোগান ঠিক রাখা দরকার। না'হলে দাম বাড়বে।

সমস্ত জিনিসের যোগান তো আর সরকারের হাতে নেই। উল্টে বেশির ভাগ ভোগ্যপণ্যের যোগান দেয় ব্যক্তিগত পুঁজির মালিকানাধীন ক্ষেত্র যাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো উৎপাদনে লভ্যাংশের পরিমাণ ঠিক রাখা বা বাড়ানো। সাধারণ ভোগ্য-বস্তুর দাম তুলনামূলকভাবে বিলাস সামগ্রীর থেকে কম। ফলে বস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্পপতিরা স্বাভাবিকভাবেই চাইবে এমন ধরণের বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে যার বাজারজাত মূল্যে উৎপাদন খরচের অনেক অনেক বেশি। ভারতবর্ষে বিগত চল্লিশ বছরের অর্থনৈতিক প্রগতি এই ধরনের বস্ত্র ক্রেতার সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে; যারা ৫,০০০ টাকা মূলের প্যাণ্টের কাপড় কেনে বা ২০-২৫ হাজার টাকা মূল্যের ঘড়ি কেনে। TITAN বা HMT কোম্পানীগুলো বাজার বিশ্লেষণ করে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে, এই ধরনের উচ্চমূল্যের দ্রব্যর চাহিদার পরিমাণ যা, তা'তে তারা লাভজনকভাবে ঐ ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। যাই হোক্, উৎপাদনের সংখ্যাতত্ত্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, বিলাসসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির হার সাধারণ ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের হারের থেকে অনেক অনেক বেশি। নিম্নমূল্যের আবাসস্থল তৈরি করার থেকে উচ্চমূল্যের গৃহ তৈরিতেই ব্যক্তিগত পুঁজি বেশি উৎসাহী। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির বেশিরভাগ অংশই নিম্ন আয়ভুক্ত শ্রেণীরই কলেবর বৃদ্ধি করছে। ফলে সাধারণ ভোগ্যবস্তুর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এই পরিমাণ চাহিদা বৃদ্ধি অবশ্যই উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। যেখানে লভ্যাংশের পরিমাণ না বাড়লেও মোট লাভের পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন চাহিদামাফিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না? লক্ষ্য করার বিষয় যে সাবান, তেল, চিনি, বস্ত্র ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন মুষ্টিমেয় কিছু উৎপাদকের কুক্ষিগত। যাদের মূলনীতি হলো বাজারে যা চাহিদা তার থেকে কম যোগান দিয়ে বাড়তি মুনাফা আয় করা। তা না হয়ে যদি উৎপাদকের সংখ্যা অনেক হতো তা হলে উৎপাদকদের লক্ষ্য হতো যোগান বাড়িয়ে মোট আয় বাড়ানো। লভ্যাংশের পরিমাণ হয়তো একই থাকবে। সমগ্র বাজারে নিজের নিজের অংশ বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টায় দাম কমিয়ে অসংখ্য উৎপাদক একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই ভাবেই রেডিও, সাদা-কালো টেলিভিশন, বা গ্যাস উনুন-এর দাম ক্রমশঃ কমেছে। অন্যদিকে সরকার যদিও bulk drug-এর দাম কম রাখতে চেষ্টা করেছে ঐ bulk drug ব্যবহার করে oligopolist রা তাদের formulation drug-এর দাম ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিয়েছে। Formulation drug-এর উৎপাদন খরচ এবং বাজার মূল্যের মধ্যে বিশাল তফাৎ। যেবাড়ি তৈরি করতে ৫ পয়সা খরচ পড়ে, তাই ২ টাকায় বিক্রি করা হয়! ক্রেতারা কিনতে বাধ্য হয় কারণ ওর কোন বিকল্প অল্পদামে পাওয়া যায় না, অথচ বাড়িটা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যায় যে আখ থেকে চিনি সংগ্রহের হার উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা অনেক বাড়ানো সম্ভব হয়েছে; অথচ চিনির মূল্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে চিনির সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কোন একটা সাধারণ নির্বাচনের আগে বা পরে। সংগঠিত মুষ্টিমেয় চিনি উৎপাদকরা নির্বাচন তহবিলে অর্থদান করে যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। ফলে সরকারকে দিয়ে অতি সহজেই সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি করিয়ে নিতে পারে। এবং লেভিমুক্ত চিনির বাজার দরও আনুপাতিক হারে বাড়াতে পারে।

চাহিদা-যোগানের ভারসাম্য নয়, আসলে oligopolistরা যেমন বহু জিনিসের বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করে তেমনই সংগঠিত ব্যবসায়ীরাও বাজার দর ওঠানামায় সক্রিয় অংশ নেয়। কোন জিনিসকে কিছুদিন গুদামজাত করে রাখলেই বাজারে একটা কৃত্রিম ,চাহিদা সৃষ্টি হয়। জিনিসটার দাম বাড়ে। মোটা মুনাফা আয় হয়। গুদামজাত করে ফেলে

রাখার অবশ্য একটা খরচ আছে। যেমন, পুঁজি অব্যবহৃত থাকার কারণে সে ন্যূনতম সুদ-টাও হারাচ্ছে, ইত্যাদি। আসলে এই ফাটকা কারবারীরা বর্তমানে এক বিরাট পরিমাণ কালো টাকার মালিক। এবং এই কালো টাকা কালো অর্থনীতি যথা মজুতদারী বিস্তারে যথেষ্ট সক্রিয়। কারোও মতে, কালো টাকার মোট পরিমাণ প্রায় ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের সমান। আবার কারও মতে কালো টাকা জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক। যেটাই সত্যি হোক একথা অনস্বীকার্য যে, কালো টাকা একটা পাল্টা অর্থনীতি গড়ে তুলেছে। এবং হিসাব বহির্ভূতভাবে অর্থনীতিতে অর্থের যোগান বৃদ্ধি করছে। তাই শুধুমাত্র সরকারের ঘাটতি বাজেট দেখে মূল্য-বৃদ্ধির হার গণনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

এই কালো টাকা জিনিস মজুত করে জিনিসের দাম বাড়াচ্ছে, শহরের সম্পত্তির ফাটকা বাজারী করে মূল্য আকাশছোঁয়া করছে, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন-এর আওতার বাইরে আমদানীকৃত জিনিসের দাম বাড়াচ্ছে, এবং এই জাতীয় বহু ক্ষেত্রে নিয়োজিত হচ্ছে, যা সমাজের বাঞ্ছনীয় নয়। ফল হচ্ছে, নিম্ন আয়ভুক্ত জনসংখ্যা শহর থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। শ্রমিকদের জন্য অল্প খরচের বাড়ি তৈরি করার জমি পাওয়া যাচ্ছে না। উৎপাদনের সাথে সাথে পাট, তুলা ইত্যাদি জিনিস কিনে নিয়ে গুদামজাত করছে। এবং পরে অনেক বেশি দামে ঐ কাঁচামাল শিল্পসংস্থাকে বিক্রি করছে। ফলে কাঁচামালের পরিমাণগত যোগান ঠিক থাকলেও উৎপাদন ব্যয়বহুল হচ্ছে। অন্যদিকে, মূল্যমানের অস্থিতিশীলতা কৃষকদের বুঝতে দিচ্ছে না জমিকে কিভাবে লাভজনক উপায়ে ব্যবহার করবে—কতটা জমিতে পাট লাগাবে বা আদৌ লাগাবে কিনা। সরকারী সংস্থাগুলোও এই ফাটকা কারবারের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না বা পারার চেষ্টা করছে না।

ভারতবর্ষের শিল্পক্ষেত্র বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি এমনকি বহুরকমের কাঁচামাল আমদানী করা হয়। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে ঐসব জিনিসের দাম বাড়লে দেশের মধ্যে জিনিসের উপর তার প্রভাব পড়ে। আবার, বহুক্ষেত্রে আমরা যে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করি তার একটা বড় অংশ নির্দিষ্ট দেশী বা বিদেশী কোম্পানীর কাছ থেকে প্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ কাঁচামাল, ইত্যাদি কেনার চুক্তিতে দায়বদ্ধ। এবং দেখা গেছে যে চুক্তিবদ্ধতার কারণে যে জিনিস আমরা বিদেশে কিনছি তার ক্রয়মূল্য আন্তর্জাতিক খোলা বাজার মূল্যের থেকে অনেক বেশি। ফলে আমাদের দেশে প্রযুক্তিগত উন্নতি উৎপাদন খরচ কমাচ্ছে না, বরং বাড়াচ্ছে।

আরও একভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। আমাদের অর্থনীতির Core sector বা ইস্পাত, বিদ্যুৎ, কয়লা, ইত্যাদি উৎপাদন পাবলিক সেক্টরের অধীন। Management-এর ত্রুটির কারণেই মূলত Core public sector লাভজনক না হয়ে লোকসানের পরিমাণ বছর বছর বাড়িয়ে চলেছে। দায় চাপছে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। মূল্য বৃদ্ধি করে লোকসানের পরিমাণ কমানোর চেষ্টা হচ্ছে। ফলে গোটা অর্থনীতি জুড়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, কারণ এই বস্তুগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় সমস্ত জিনিসের উৎপাদনের সাথেই জড়িত।

সবশেষে বলা যায় যে শিল্পের কাঠামোগত পরিবর্তনের ভ্রান্ত সরকারী পরিকল্পনা এবং নীতি লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির এক অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের বিকাশের ওপর মূল লক্ষ্য রাখা হলো এবং ভেবে নেওয়া হলো যে, ভোগ্যবস্তু মূলত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যোগান দেবে এবং বস্ত্র, চিনি, জুতো, কাগজ, ইত্যাদি শিল্পের বিকাশ সরকারী গুরুত্ব হারালো। আরও পরে প্রায় ষাটের দশকের শেষদিকে সরকারী প্রাথমিক গুরুত্ব গিয়ে পড়লো পেট্রো-রসায়ন শিল্প বিকাশের দিকে। অথচ এই শিল্পের মূল কাঁচামাল, ন্যাপথা, গোটাটাই আমদানী করতে হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ন্যাপথার মূল্যবৃদ্ধি বা আমাদের মুদ্রার বিনিময় মূল্যের অবনমন ন্যাপথার আমদানীমূল্য বাড়িয়েই চলেছে। ফলে পেট্রো-রসায়ন শিল্পের সাথে জড়িত হয়ে পড়া অসংখ্য শিল্প ও কৃষি-সামগ্রীর দাম বেড়ে চলেছে।

পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে দেখতে পাওয়া যায় যে দাম বাড়ছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নও ঘটছে। অন্যদিকে চীনের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে অথচ দামের উল্লেখনীয় বৃদ্ধি ঘটছে না বা মূল্যমান স্থিতিশীল রয়েছে। আর ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা হলো সম্পূর্ণ আলাদা। দাম বাড়ছে অথচ অর্থনীতি প্রায় অনড়।

৪০ জনের হত্যার পরও

দাল্লার শ্রমিকরা কারখানা দখলের লড়াই চালাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ২রা জুন '৯১ দাল্লা সিমেণ্ট কারখানায় **পুলিশের** গুলিতে ৪০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। স্বাধীন ও পরাধীন ভারতে পুলিশের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের তালিকায় জালিয়ানওয়ালাবাগ, আরওয়াল এর সাথে যুক্ত হল আরও একটা নাম—উত্তরপ্রদেশের 'দাল্লা'। মুলায়ম সিং সরকারের আনুকুল্যে পাওয়া উত্তরপ্রদেশ সিমেণ্ট কর্পোরেশনের দখল নিতে এলে শ্রমিকরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে দাল্লা ইউনিটের গেটে। নতুন মালিকানা পাওয়া সঞ্জয় ডালমিয়ার পক্ষ নিয়ে শ্রমিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ ও তার নিজস্ব গুণ্ডাবাহিনী ২রা জুন '৯১। ৬০০ রাউণ্ড গুলি ৪০ জন শ্রমিককে হত্যা ও শতাধিক মানুষকে আহত করে। প্রত্যক্ষ-দর্শীদের বক্তব্য—"প্রথম গুলি চালায় সঞ্জয় ডালমিয়ার বে-সরকারী গুণ্ডাবাহিনী"। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগে—কেন ঘটাতে হল তৃতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ?

মুলায়ম সিং যাদব '৮৯ সালে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েই ঘোষণা করেন—"যেসব সরকারী সংস্থায় ১০ কোটি টাকার বেশি লোকসান চলছে সেগুলি হয় বিক্রি করে দেওয়া হবে নতুবা বন্ধ করে দেওয়া হবে।" এই নীতির ফলেই রায়বেরিলির উচাহার বিদ্যুৎ প্রকল্প, রাবার ইণ্ডিয়া লিমিটেড ও চলচ্চিত্র নিগম ব্যাক্তি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরিকল্পনা করা হয় স্টেট সিমেণ্ট কর্পোরেশনকেও বে-সরকারী-করণ করার।

১৯৯০-এর মে দিবস উত্তরপ্রদেশ সিমেণ্ট কর্পোরেশন-এর শ্রমিকদের আমৃত্যু স্মরণ থাকবে। ১লা মে-র সংবাদপত্রেই তারা প্রথম জানতে পারে যে, তাদের কারখানা বিক্রি করার জন্য সরকার মালিক খুঁজছে। ঐইদিন সংবাদপত্রে সরকার এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ আলোচনার আমন্ত্রণ জানায় ইউ পি সি সি এল কিনতে আগ্রহী ক্রেতাদের। ইতিপূর্বে উত্তরপ্রদেশ **সরকার** কর্পোরেশন-এর বে-সরকারীকরণ সম্পর্কে শ্রমিকদের **কিছুই জানায়নি**। উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে **হাজির হয়েছিল** কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সি সি আই, এ সি সি, গুজরাট অম্বুজা, মোদী সিমেণ্ট এবং ডালমিয়া ইণ্ডাষ্ট্রীজ। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা পিছিয়ে থাকেনি। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে 'শ্রমিক সমবায়' গড়ে কারখানা চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। শ্রমিকদের এই প্রস্তাব সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করেই সঞ্জয় ডালমিয়ার ডালমিয়া ইণ্ডাষ্ট্রীজের সাথে চুক্তি করে। চুক্তির মূল শর্তগুলি ছিল ঃ (১) ডালমিয়া সিমেণ্ট কর্পোরেশনের পরিচালনভার অধিগ্রহণ করবে 'যেখানে যেমন আছে' সেই ভিত্তিতে (২) যৌথ উদ্যোগে ডালমিয়া ও উঃ প্রঃ সরকারের শেয়ার থাকবে যথাক্রমে ৫১% ও ৪৯%, (৩) ডালমিয়া ইণ্ডাষ্ট্রীজ ও তার অধীন ১২টি সংস্থাকে ৫১% শেয়ার দেওয়া হবে শেয়ার প্রতি ৭৫ টাকা মূল্যে (যার মূল্য শুরুতেই ছিল ১০০টা)। শেয়ারের মোট মূল্য ২৬.১২ কোটি টাকা। (৪) চুক্তির সময় ডালমিয়া দেবে ১ কোটি টাকা, তার তিনমাস পর ২ কোটি ও আরও ছমাস পর ২ কোটি টাকা। বাকী প্রায় ২১ কোটি টাকা সরকার ডালমিয়াকে ঋণ হিসেবে ছাড় দেবে। এছাড়াও সেলস ট্যাক্স ছাড়, সরকারী শেয়ার পরিবর্তনে ডালমিয়াদের প্রথম সুযোগ ইত্যাদি। শ্রমিকদের জন্য চুক্তিপত্রে শুধু বলা আছে 'শ্রমিকরা যেখানে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকবে।'

ফেব্রুয়ারী মাসে এই চুক্তির পর শ্রমিকরা আরও ঐক্যবদ্ধ হয়। শ্রমিক এবং প্রযুক্তিবিদরা একত্রে প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। কারখানা বিক্রির বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারীরা এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন করে। ১৬ই অক্টোবর ১৯৯০ হাইকোর্ট কারখানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ জারি করে। স্থগিতাদেশ অগ্রাহ্য করেই উঃ প্রঃ সরকার কারখানা হস্তান্তরের কাজ শুরু করে দেয়। ২রা জুন '৯১ হাইকোর্টের রায় অবমাননা করে উত্তরপ্রদেশ সরকার দাল্লা সিমেণ্ট ইউনিট ডালমিয়াদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রতিরোধরত শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়।

ডালমিয়া ইণ্ডাষ্ট্রীজ-এর হাতে কি পরিমাণ সম্পত্তি তুলে দেওয়ার জন্য সরকার সেদিন হত্যা করল ৪০ জন শ্রমিকের তাজা প্রাণ ? হিসেবে দেখা যাচ্ছে ২৬.১২ কোটি টাকায় সঞ্জীব ডালমিয়া মালিকানা পেল প্রায় সাড়ে সাতশ কোটি টাকার। যে সম্পত্তি পেল শতাধিক শ্রমিকের বুকে গুলি চালিয়ে তার জমির মূল্য ১৩৫ কোটি টাকা, বাসস্থানের মূল্য ৫৫ কোটি টাকা, মাইনিংএর

অধিকার বাবদ ২৪'৮৩ কোটি টাকা, সেলস ট্যাক্সে বিশেষ সুবিধার কারণে ১৯৪'৩৩ কোটি টাকা, সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ মকুব ৭'২ কোটি, ইনস্টলমেন্টে বকেয়া পরিশোধের সুযোগের জন্য সুদ বাবদ ছাড় পাওয়া যাবে ৩'৬৫ কোটি টাকা সহ আরও বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা ও ছাড়। এই বিশাল সম্পত্তির মালিকানা চায় শ্রমিকরা। যে শিল্পের বাজার আছে এমন সরকারী পরিচালনাধীন সংস্থা তারা ব্যাক্তি মালিকের হাতে তুলে দিতে রাজী নয়।

উত্তরপ্রদেশ সিমেন্ট কর্পোরেশনের অধীন চুর্ক, চুনার ও দাল্লার শ্রমিকরা সেদিন কি অপরাধ করেছিল? তারা আওয়াজ তুলেছিল সরকারী সম্পত্তি ব্যাক্তি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না। সিমেন্ট শিল্পের বাজার আছে, যোগ্য পরিচালনার মাধ্যমে একে লাভজনক করে তুলতে হবে। সর্বোপরি তারা দাবি জানিয়েছিল যে যে শর্তে সরকার এই কারখানা ডালমিয়ার হাতে তুলে দিতে চাইছে সেই সেই শর্তে শ্রমিকরা কারখানার মালিকানা নিতে চায়। শ্রমিক সমবায়ের মাধ্যমে কারখানার পরিচালনব্যবস্থা অধিগ্রহণ করলে ৭ বছরের মধ্যেই তা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে। শ্রমিকদের এই প্রস্তাবের জবাব দিল সরকার গুলি চালিয়ে। দাল্লার শ্রমিক-কর্মচারীরা শ্রমিক-সমবায়-এর সেই দাবি আজও ছাড়েনি। ৪০ জন শ্রমিকের মৃত্যু দাবি আদায়ে আরও দৃঢ় করেছে তাদের মনোবল। তারা শুধু মৃত শ্রমিক পরিবারের ক্ষতি পূরণের দাবিতেই লড়াই সীমাবদ্ধ রাখেনি। তাদের মূল দাবি কারখানা দখল। বম্বের কামানি টিউবখ্যাত শ্রমিকনেতা থানকাপ্পনের সহযোগিতায় তা আরও শক্তিশালী হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের শেষ নির্বাচনে দাল্লায় শ্রমিক নিধন ছিল আলোচ্য বিষয়। মুলায়ম সিং যাদব সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতায় এল বি জে পি-র সরকার। নির্বাচনের পূর্বে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা ক্ষমতায় এলে শ্রমিক-কর্মচারিদের দাবি পূরণ করবে। আর আজ! আজ তারা শ্রমিকদের দাবি সম্বন্ধে নীরব। আর সে কারণে কারখানার চারটে ইউনিয়নের মধ্যে বি জে পি পরিচালিত শ্রমিক সংগঠন বি এম এস এখন অন্যসুরে কথা বলছে। বি জে পি সরকারের এই নীরবতার পিছনে এক অন্য কারণও থাকতে পারে। কারখানার দখল নিতে চায় যে সঞ্জয় ডালমিয়া সে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা বিষ্ণুহরি ডালমিয়ার ছেলে। স্বাভাবিকভাবেই বি জে পি সরকার নির্বাচনপূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষার টালবাহানা করছে। দাল্লার শ্রমিকরা তবু থেমে নেই। বি এম এস বিরোধীতা করলেও ২৬শে জুন শ্রমিকদের সমর্থনে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিতে ও অন্যান্য বেশকিছু কারখানায় সফল ধর্মঘট হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের সহযোগিতায় অবস্থান, ধর্ণা, বিক্ষোভ চলছে। বি জে পি সরকার নীরব থাকলেও শ্রমিক সমবায়-এর দাবি সোচ্চার হচ্ছে। এখন দেখা যাক শেষ কথা বলে কে?

আসুন আমরা সবাই চিঠি লিখি

মধ্যপ্রদেশের ভিলাই-উরলা শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা তাদের চাকরী স্থায়ী করার জন্যে এবং ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে এক বছর ধরে লড়াই চালিয়ে আসছেন। মধ্যপ্রদেশ পুলিশ এই লড়াকু শ্রমিকদের ওপর নির্মমভাবে লাঠি চালিয়েছে আর ধরপাকড় চালাচ্ছে। ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার নেতা শ্রীশঙ্কর গুহ নিয়োগীকে আদালতের আদেশে মধ্যপ্রদেশের বেশ কয়েকটা জেলায় ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। পরে ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা আদালতের এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করলে, পরবর্তী শুনানী পর্যন্ত এই আদেশ স্থগিত রাখে।

গত ২৪শে আগস্ট প্রায় ১৫০ জন গুণ্ডা শ্রমিকদের আক্রমণ করে। এদের মধ্যে অনেকের হাতেই তরোয়াল ছিল। এদের আক্রমণে তিনজন নেতা গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন—এদেরকে পরে হাসপাতালে অপারেশন করতে হয়। এই ঘটনার বিরুদ্ধে যখন শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন, তখন পুলিশ ১৮১ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে।

ঐ অঞ্চলের সাতটি ইউনিটের মালিক নভিন সাহ পুরো সময়টা উপস্থিত থেকে পুলিশকে মদত দেয়।

ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা এই ঘটনার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলছেন। তাঁরা বিভিন্ন সংগঠনের কাছে এই ঘটনার প্রতিবাদ করে চিঠি পাঠানর অনুরোধ করেছেন। নাগরিক মঞ্চ এই ঘটনার প্রতিবাদ করে দুটি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে। চিঠি পাঠানর ঠিকানা,

১। পি এস টোমার, জেলা কালেকটর (দুর্গ)
জেলা কালেকটরেট, মধ্যপ্রদেশ

২। চিফ্ সেক্রেটারি, মধ্যপ্রদেশ সরকার, বল্লভভবন,
ভূপাল, মধ্যপ্রদেশ।

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বকেয়ায় সরকারী সংস্থা

এদেশে শ্রমিকদের পাওনা ফাঁকির তালিকাটা বেশ বড়। নিয়মিত বেতন বাকী পড়ে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা জমা পড়ে না, এসবই আমাদের জানা। দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের অনেকেরই জানা নেই, শ্রমিকের পাওনা বাকী রাখা মালিকদের এই লম্বা তালিকার অনেকখানি জুড়ে আছে সরকারী উদ্যোগগুলো। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত রিপোর্টই তার প্রমাণ। নিচের তালিকাটায় একটু চোখ বোলানো যাক্। ৩১.৩.৯০ তারিখ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী বকেয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হিসেব ঃ

বকেয়া টাকার পরিমাণ (কোটিতে)

	সারা দেশে	শুধু পঃ বঙ্গে
সরকারী ক্ষেত্র	৫৭.৪৭	২৩.২৪
বেসরকারী ক্ষেত্র	১৭৩.০৫	৯০.৪৮
মোট	২৩০.৫২	১১৩.৭২

দেখা যাচ্ছে, সারা দেশে বকেয়া টাকার পরিমাণের পাঁচভাগের একভাগ বা তারও একটু বেশী শুধু সরকারী ক্ষেত্রেই। আর সেই সরকারী ক্ষেত্রেরও শতকরা চল্লিশ ভাগেরও বেশী শুধু পশ্চিমবঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়মিত প্রকাশনা 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'—এই রিপোর্টেও বকেয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হিসেব দেওয়া আছে। কিন্তু তা শুধুই মোট বকেয়া পরিমাণের হিসেব। অর্থাৎ ওপরের তালিকা অনুযায়ী ১১৩.৭২ কোটি টাকা। আশ্চর্যের বিষয়, এই মোট পরিমাণের কতখানি শুধু সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সেটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যেটা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

এই বিপুল পরিমাণ বকেয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের মধ্যে রাজ্য সরকারের নিজস্ব দায়ও কিছু কম নয়। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ীই পশ্চিমবঙ্গের সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে চিত্রটা এই রকম ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম	বকেয়া টাকার পরিমাণ (লাখে)
১। বসুমতী কর্পোরেশন	২৭.৫৯ (রাজ্য)
২। মহারাক্ষী কটন মিলস্	৭.১১ („)
৩। সাইকেল কর্পোঃ অফ ইণ্ডিয়া (ইউনিট-১)	২০.৪৪
৪। „ (ইউনিট-২)	১২.০২
৫। স্টেট ফিশারিজ ডেভেঃ কর্পোঃ লিঃ	৫.৪৬ (রাজ্য)
৬। সাইকেল কর্পোঃ অফ ইণ্ডিয়া (আসানসোল)	২০০.০০
৭। ডি এন্ দে হোমিও মেডিঃ কলেজ এ্যাণ্ড হসপিটাল	৬.৫৩ (রাজ্য)
৮। লুম্বিনি পার্ক মেন্টাল হস্পিটাল	৩.১৫ („)
৯। সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সঃ কর্পোঃ	৫০.০০ („)
১০। টায়ার কর্পোঃ অফ ইণ্ডিয়া ইউনিট ইনচেক টায়ার (লিঃ)	৫.৩৭
১১। সাইকেল কর্পোঃ অফ ইণ্ডিয়া (লিঃ)	৮.০০
১২। মাইনিং এ্যাণ্ড এ্যালায়েড মেশিনারি কর্পোঃ লিঃ	৬৮০.৭৪
১৩। ভারত প্রসেসিং এ্যাণ্ড মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং লিঃ	৩২.৬০
১৪। হিমুল লিঃ	৯.৬৪ (রাজ্য)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বেসরকারী শিল্প মালিকদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারও শ্রমিক বঞ্চনার দায় সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড জমা রাখার ব্যাপারে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান টাকা জমা রাখে সরকারের কাছে (প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কমিশনার), আর দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজেদের কাছেই এ টাকা জমা রাখবার অধিকার পায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশেষ ছাড়-প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলি এই বিশেষ সুবিধে পায় নির্দিষ্ট এক প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে। এই প্রতিশ্রুতি হল, সরকারি হারেই তারা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার ওপর সুদ দেবে।

আশ্চর্যের বিষয় হল, বকেয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার সিংহ-ভাগেরই দায় এইসব বিশেষ 'ছাড়প্রাপ্ত' প্রতিষ্ঠানগুলিরই। শুধু পশ্চিমবঙ্গের মোট বকেয়া ১১৩.৭২ কোটি টাকার মধ্যে এই 'ছাড়প্রাপ্ত'-দের ক্ষেত্রেই বকেয়া টাকার পরিমাণ ১০৭.২৬ কোটি টাকা। সুতরাং অবিলম্বে এইসব 'ছাড়প্রাপ্ত'দের বিশেষ অধিকার কেন খর্ব করা হবে না, সরকারকে সে কথা ভেবে দেখতে হবে।

বি আই এফ আর-এ নাগরিক মঞ্চ

গত ৩০শে মে ১৯৯১ সারাভাই গোষ্ঠীর মালিকানার আওতায় থাকা স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল এবং ওপেক ইনোভেশনএ তালা ঝুলেছে। এর আগেই ২৮শে অক্টোবর ১৯৮৭-তে সারাভাই গোষ্ঠী ওপেক কে রুগ্ন ঘোষণা করে বি আই এফ আর-এর কাছে আবেদন জানায়।

গত ১লা আগস্ট ১৯৯১, দিল্লীতে বি আই এফ আরের ২ নম্বর বেঞ্চে এসপি-ওপেক-এর মামলার শুনানী হল। এই শুনানীর এক উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এই প্রথম বি আই এফ আর, এই মামলার অংশীদার নয় এমন একজন প্রতিনিধিকে জনস্বার্থে শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে দিলো। এস পি-ওপেক কে ঘিরে সারাভাই গোষ্ঠীর বেআইনী কাজে শঙ্কিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গণবিজ্ঞান সংস্থা, স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার ও সমাজকর্মীদের অনেক সংগঠন আলাদাভাবে এবং নাগরিক মঞ্চ এই শুনানীতে অংশগ্রহণের দাবী জানায়। বি আই এফ আর এই দাবী মেনে নেয় এবং নাগরিক মঞ্চ-র প্রতিনিধি শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন। শুরুতেই নাগরিক মঞ্চ, এস পি ওপেক কে ঘিরে সারাভাই গোষ্ঠী যে বেআইনী কাজকারবার চালিয়েছে সেগুলো ফাঁস করে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। ঐ শুনানীতে উপস্থিত সবাই একমত হন, যে আলাদা করে ওপেক কোম্পানীকে বাঁচানো যাবে না। তখন প্রস্তাব ওঠে যে এস পি ওপেক কে আবার ১৯৮২ সালের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হোক। এতে মালিকপক্ষ আপত্তি করে। তখন আবার প্রস্তাব ওঠে এস পি-ওপেক কে বরোদার সারাভাই গোষ্ঠীর কোম্পানী এ এস ই থেকে আলাদা করা হোক। এ প্রস্তাবও নাকচ করে মালিকপক্ষ। তখন বি আই এফ আর ওপেক কোম্পানী গুটিয়ে ফেলার প্রস্তাব দেয়। এতে মালিক পক্ষ রাজী হয়ে যায়। ঐ শুনানীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি কোম্পানী গুটিয়ে নেবার আগে তিনমাসের সময় চান। এই তিনমাসে তাঁরা বিকল্প রাস্তা খুঁজবেন বলে বি আই এফ আর কে জানান। যদিও উপস্থিত সবাই মনে করেছেন ওপেকের ঘাড়ে ঋণ এবং অন্যান্য যে পরিমাণ বোঝা রয়েছে তা স্বীকার করে নিয়ে অন্য কোনো ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই কোম্পানির দায়িত্ব নিতে রাজী হবে না।

নাগরিক মঞ্চ এস পি-ওপেক-এর পরিচালনমণ্ডলী বদল করে নতুন পরিচালন মণ্ডলী গঠন এবং তাতে শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব দাবি করে। সুপ্রীম কোর্ট আদেশ দিলে বি আই এফ আর সেই নির্দেশ কার্যকর করতে পারে। বোম্বের কামানী টিউবস এই ভাবেই একটি শ্রমিক সমবায়ের ভিত্তিতে কারখানা চালিয়ে তাকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করেছে। এস পি-ওপেকেরও এই সম্ভাবনা রয়েছে। ১লা আগষ্টের শুনানীর পর যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে এখন হয় ওপেক কোম্পানী উঠে যাবে এবং ৭০০ জন কর্মচারী বেকার হবেন— নয়তো শ্রমিক প্রতিনিধি অথবা শ্রমিক সমবায়ের ভিত্তিতে শ্রমিকদেরই কারখানা চালাতে হবে। হাতে সময় রয়েছে মাত্র দু'মাস।

নাগরিক মঞ্চ প্রকাশিত পুস্তিকা

১। বি আই এফ আর সম্পর্কে জানার কথা
২। কামানি টিউবের ইতিকথা
৩। সমবায় একটি সমীক্ষা
৪। গোল্ডেন ফাইবার (ইংরাজী)
৫। লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল— অ্যান অলটারনেটিভ ভিউ (ইংরাজী)
৬। এগেনষ্ট দ্য ওয়াল (ইংরাজী)
৭। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

এছাড়াও বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কিত সমীক্ষা পুস্তিকা।

সংগ্রহ করুন।

পথে বসেছেন শ্রীদুর্গার শ্রমিকরা

নাগরিক মঞ্চ-র পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে অনুসন্ধান চালান হয়। অনুসন্ধানের বিষয় যেমন থাকে অঞ্চল সংলগ্ন শিল্পের অবস্থা, পাশাপাশি অনুসন্ধানী দলের জানার বিষয় থাকে অঞ্চলের বন্ধ কারখানার শ্রমিক ও তাদের পরিবার পরিজনের কারখানা বন্ধ হওয়ার পরবর্তী শারিরীক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। এবারের প্রতিবেদন সেরকমই এক অনুসন্ধানের সারসংক্ষেপ। পত্রিকার স্বল্প পরিসরে এ ধরণের বেশ কিছু হৃদয় বিদারক অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানলেও পাঠককে জানাতে পারিনা। গত মার্চ মাসে আমাদের অনুসন্ধানী দল হাজির হয়েছিল কোন্নগরে। শ্রীদুর্গা কটন মিল বন্ধের পর শ্রমিকরা কেমন আছেন তারই প্রতিচ্ছবি এই প্রতিবেদন।

কোন্নগরের শ্রীদুর্গা কটন মিলকে ওয়াইণ্ডিং আপের নির্দেশ দিয়েছে বি আই এফ আর। ১২ মার্চের সংবাদপত্রে এই ছোট্ট বিজ্ঞপ্তিটিতে আসলে লুকোনো রয়েছে এক নিদারুণ পরিহাস।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের শ্রমিক আন্দোলনে শ্রীদুর্গার নাম বার বারই শোনা গেছে। শ্রীদুর্গার মার্কিন থান কাপড়ের কথা এখনও ভুলে যান নি অনেকেই। অথচ ১৯৭১ সালে সেই শ্রীদুর্গার শরীরেই 'রুগ্নতার' লক্ষণ দেখা দিল। মিলের পরিচালনভার গেল আই আর সি আই (পরে আই আর বি আই)-এর হাতে। চোদ্দ বছর পরে (১৯৮৫) আই আর বি আই ছেড়ে দেবার পর শ্রমিকরা নিজেদের উদ্যোগে কয়েক মাস চালাবার চেষ্টা করেছিলেন ; অবশেষে ১৯৮৬-র জুলাইয়ে বন্ধ হয়ে গেল শ্রীদুর্গা। মিলের কাঠামোটা এখনও টিকে আছে ; কিন্তু শ্মশানের মতো শূণ্য খাঁ খাঁ করে ভেতরটা। শ্রমিকরা কেউ মারা গেছেন, কেউ আত্মহত্যা করেছেন ; কেউ বেঁচে আছেন ধুঁকতে ধুঁকতে।

কোন্নগরের ক্রাইপার রোডের দুধারে শ্রীদুর্গার অনেক শ্রমিককেই এখনও দেখা যাবে। কেউ পান সিগারেটের দোকান দিয়েছেন, যেমন যতীন দত্ত। কেউ চায়ের স্টল যেমন অরবিন্দ কর। কোন রকমে একটা মুদির দোকান চালাচ্ছেন জহর মান্না। মিল যে নীলামে উঠল প্রায়, এ খবর তাদের জানা নেই। কেউ বলেনি। শ্রীদুর্গাকে মৃতই ধরে নেওয়া হয়েছে ; তাই ইউনিয়ন নেতারাও আর এ-ধার মাড়াতে চান না। মিল খোলার জন্যে ইউনিয়ন কী করেছে বলতে পারেন না শ্রমিকরা। কারণ 'চেষ্টা হচ্ছে'-এর বেশি কিছু তাদের জানানো হয়নি কখনও। তিক্ত, বিরক্ত হতোদ্যম আজ শ্রীদুর্গার শ্রমিকরা। টালি লাইনের শ্রমিক বস্তিতে হতশ্রী সংসার আর ভাঙাচোরা স্বাস্থ্যের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হবে, ম্যাক্সিম গোর্কি বেঁচে থাকলে এদের নিয়ে গল্প লিখতেন-একদিন যারা শ্রমিক ছিল।

গল্প অনেক শোনা যায়-দারিদ্র্যের মৃত্যুর, আত্মহননের। প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই মারা গেছেন অমূল্য পাল, ব্রজহরি রায়, রঞ্জিত দত্ত আর হরেন্দ্র বর্মণের মতো শ্রমিকরা। ধুঁকতে ধুঁকতে দিন কাটাচ্ছেন মনোরঞ্জন দে, দেবনারায়ণ মণ্ডল আর সুনীল দে। অনাহার আর মানসিক দুশ্চিন্তায় প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছেন এইসব মানুষ। দিনমজুরি করার ক্ষমতাটুকুও আজ নেই তাদের।

কিন্তু শ্রীদুর্গার কাহিনী কেবল বেদনার নয় ; তার সঙ্গে মিশে আছে চূড়ান্ত অবহেলা আর শঠতা। আই আর বি আই-এর আমলে কী পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে, এখনও সে কথা বলতে পারেন শ্রমিকরা। জেনারেটরের তেলটা পর্যন্ত চুরি হত— অফিসারদের সঙ্গে যোগসাজস ছিল ইউনিয়নের একটা অংশেরও। সেই ইউনিয়নই আজ চাইছে মিলটা লাটে তুলতে। সমবায় করে চালানো হবে এই সান্ত্বনা বাক্য অনেকবার শোনানো হয়েছে শ্রমিকদের। কিন্তু এ ব্যাপারে ইউনিয়ন সত্যি কতটা উদ্যোগ নিয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে শ্রমিকদের মনে। তাই বি আই এফ আর-এর বিজ্ঞপ্তিতে যখন আজ লেখা হয়—পুনরুজ্জীবনের কোন বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা পাওয়া গেল না বলেই শ্রীদুর্গার ওয়াইণ্ডিং আপ ছাড়া গতি নেই, তখন তা একটা নির্মম পরিহাস হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রীদুর্গাকে বাঁচানোর কোন আন্তরিক চেষ্টা কি সত্যিই হয়েছিল ?

সরকারের কাছে দাবি সনদ পেশ

যে দাবীগুলি নিয়ে শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিক, কর্মচারী এবং অঞ্চলের নাগরিকরা দাবী ব্যাজ পড়বেন এবং ২১শে সেপ্টেম্বর সারাদিন প্রচারে অংশ নেবেন সেই দাবিগুলি রাজ্য সরকারের শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপতিত পাবন পাঠককে নাগরিক মঞ্চের এক প্রতিনিধিদল পেশ করেন।

২২ দফা দাবীর উল্লেখযোগ্য দাবীগুলি হোল ঃ—

১। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা দিতে হবে।

২। চটশিল্পে ন্যূনতম মজুরীর কম দেওয়া চলবে না।

৩। সমস্ত রকম মজুরী হ্রাস এবং শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে।

৪। শিল্প কারখানার জমিতে বহুতল বাড়ী নির্মাণ করা যাবে না। শিল্পের জমি ঐ কাজেই ব্যবহার করতে হবে।

৫। রাজ্য সরকার অবিলম্বে বন্ধ-রুগ্ন শিল্পের বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক।

৬। যে কোনো রুগ্ন বা বন্ধ কারখানা পুনরুজ্জীবনের স্কিমকে, বি আই এফ আর-এ রাজ্য সরকার সম্মতি দেবে না। যদি তা রাজ্য সরকার ঘোষিত মজুরী নীতির বিরোধী হয়।

এছাড়া ন্যাশনাল ট্যানারী, ক্যালকাটা কেমিকেল, ইণ্ডিয়া মেশিনারী, স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিকাল ওপেক ইনভেশন্স এবং হনুমান জুট মিল সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কাছে এই মুহূর্তে করণীয় সম্পর্কে এবং বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা হয়।

ট্যানারিতে কাজ চালু করতে হবে

(২ পাতার পর)

শ্রমিকদের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে মাননীয়া বিচারপতি শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পঃ বঃ সরকারকে কোম্পানী দেওয়া হবে বলে আদেশ দেন। রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত সংখ্যাধিক্য শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে সরকার আলোচনায় বসেনি। ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রথম কিস্তির টাকা জমা দেওয়ার দিন থাকলেও আদালত বসতে দেরী হওয়ায় ১৮ই সেপ্টেম্বর পরবর্তী দিন ধার্য হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দলমত নির্বিশেষে সংখ্যাধিক্য শ্রমিকরা একদিকে যেমন বর্তমান ম্যানেজমেণ্ট কমিটির বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছেন অপরদিকে তারাই আদালতে পঃ বঃ সরকারের হাতে কারখানার মালিকানা দেওয়ার আর্জি পেশ করেছেন। কিন্তু সিটু ও আই এন টি ইউ সি নেতৃত্বের একাংশ বর্তমান ম্যানেজমেণ্ট কমিটির সদস্য ও তাদের হাতেগোনা কয়েকজন সমর্থক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারখানা নেওয়ার উদ্যোগ বানচাল করার চেষ্টা করছেন। সরকারের প্রস্তাব সম্বন্ধে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। যারা এতদিন ধরে শ্রমিকদের সারাদিন খাটিয়েও ন্যায্য পাওনা দেয়নি, তারাই আজ "অন্য পার্টী কিনলে শ্রমিকদের অনেক টাকা দেবে—সরকার নিলে শ্রমিকরা ন্যায্য বকেয়া পাওনা থেকে বঞ্চিত হবে"—প্রচার করে শ্রমিক দরদ দেখাচ্ছে। সাধারণ শ্রমিকদের মতে, সরকারকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের কোন লোককে দিয়েই এই ইউনিয়ন নেতারা কারখানা কেনাতে চায়। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধেও শ্রমিকরা সজাগ। ম্যানেজমেণ্ট কমিটির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদের মনোবল দৃঢ় করেছে। এখন তাদের একটাই স্লোগান "কারখানায় কাজ চাই। মাস গেলে মাইনে চাই।"

২১শে সেপ্টেম্বর গণ-অবস্থান

শিয়ালদহ স্টেশন—বিকেল ৩টে।

নাগরিক মঞ্চ-র পক্ষে বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, ব্লক—বি, রুম নং—৭ কলি-৮৫ হইতে প্রকাশিত ও দিপালী প্রেস, কলি-৬ হইতে মুদ্রিত।